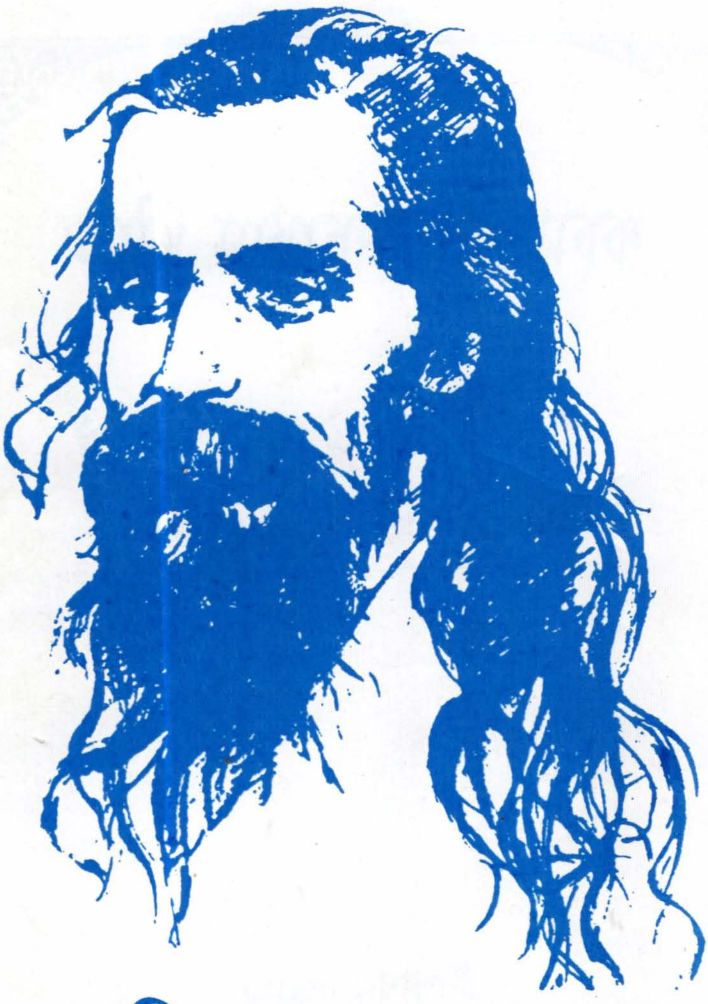


আমি সাধারণ স্বয়ংসেবক

আমি সাধারণ স্বয়ংসেবক

শ্রীমাধব সদাশিব গোলওয়ালকর

প্রেরণা প্রাকাশনী
কেশব নিকেতন, শিলচর - ৭৮৮ ০০৪

প্রকাশকের নিবেদন

প্রেরণা প্রকাশনী সবেমাত্র জন্মলাভ করেছে। দেশাত্মবোধক সৎসাহিত্য প্রকাশ করাই এই প্রকাশনীর উদ্দেশ্য। "আমি সাধারণ স্বয়ংসেবক" পুস্তিকাটি মূলতঃ মারাঠী এবং হিন্দী ভাষায় ছাপানো পূজ্য দ্বিতীয় সরসংঘচালক শ্রীগুরুজীর দেওয়া একটি বৌদ্ধিকের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদককে জানাই অশেষ ধন্যবাদ। যে সব ব্যক্তিগণ বিশেষতঃ নির্মলেন্দু, জয়া এবং চন্দনা পাণ্ডুলিপি তৈরী করতে, প্রুফ সংশোধনী এবং ছাপানোর কাজে সহযোগিতা করেছেন তাদের অবদান অনস্বীকার্য; ভবিষ্যতেও তাদের সহযোগ কামনা করি। অসাবধানবশত : কিছু ত্রুটী এই পুস্তিকাতে থেকে গেল, তারজন্য পাঠকবর্গের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। সব পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করব যদি পাঠকের এই পুস্তিকা মনঃপূত হয়।

১মাঘ, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ   প্রকাশক

প্রস্তাবনা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের দ্বিতীয় সরসংঘচালক শ্রীমাধব সদাশিব গোলওয়ালকর আমাদের সবার কাছে শ্রীগুরুজী নামে পরিচিত; এই মূল্যবান বৌদ্ধিকটি তাঁরই দেওয়া।

"আমি একজন সাধারণ স্বয়ংসেবক" এই শব্দ কয়টি দিয়ে অনেক স্বয়ংসেবক নিজের পরিচয় দিয়ে থাকেন। পরিচয়ের এই সরল সূত্র ধরে এই বৌদ্ধিক বর্গে পরম পূজনীয় শ্রীগুরুজী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সমস্ত বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করেছেন।

পরম পূজনীয় আদ্য সরসংঘচালক ডাক্তার হেডগেওয়ারজীর জীবনের প্রসঙ্গ সমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রীগুরুজী সমাজে কী ধরণের ব্যবহার হওয়া চাই, শাখা কিভাবে চালাতে হয়, শাখার আশেপাশের লোকের সাথে কিরূপ সম্পর্ক রাখতে হয়, চরিত্র কেন শুদ্ধ হওয়া চাই, ব্যবহার কেন স্নেহপূর্ণ রাখতে হয় ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত সরল, সাবলীল এবং সূত্রবদ্ধ ভাবে বলেছেন।

নিজে বললে কি হবে সংঘের সাধারণ স্বয়ংসেবক কিন্তু সাধারণ নয়। তারমধ্যে এক পরিচ্ছন্ন অসামান্যতা রয়েছে। এই অসাধারণত্ব সম্পর্কে তার গর্ববোধ হওয়া তো দূরের কথা বরং সে বড়ই উদাসীন। কিন্তু শ্রীগুরুজী বলছেন— সাধারণ স্বয়ংসেবক হওয়া প্রতিষ্ঠার কথা। গর্ববোধ করার জন্য এরমত অন্য আর কিছু থাকতে পারেনা। পদ এবং অধিকার কেবল ব্যবস্থার জন্য; ভিত্তি হচ্ছে স্বয়ংসেবক হওয়া।

এই বৌদ্ধিকে আর একটি মূলভূত বিষয় এসেছে, আমাদের সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজের সংগঠন করতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্য হিন্দু সমাজে এক ছোটখাটো সংগঠন দাঁড় করানো নয়। সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজের সংগঠনই আমাদের লক্ষ্য। সম্পূর্ণ সমাজের চিত্র আমাদের চোখের সামনে থাকা চাই। সমাজের সব ব্যক্তিই সংঘ স্থানে আসবেন এমন কথা নেই; কিন্তু নগরবাসী, গ্রামবাসী, বনবাসী সবাই আমাদের ভাই। তাঁদের সাথে যাতে আমাদের স্থায়ী সম্পর্ক থাকে; প্রাণবন্ত আত্মীয়তাপূর্ণ,

স্নেহ, বিশ্বাস এবং পরস্পর সহযোগিতার সম্পর্ক যাতে অটুট থাকে তার চিন্তা আমাদের করতে হবে। শ্রীগুরুজী বলছেন– 'তারজন্য যত কার্যকর্তা প্রয়োজন তত কার্যকর্তা-যুক্ত নিত্য শাখা সারাদেশে ব্যাপ্ত হওয়া চাই।' সাধারণ স্বয়ংসেবকদের উপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত এবং এটা তাদের আজীবন কর্তব্য।

শ্রীগুরুজীর বক্তব্য হলো, এধরণের সাধারণ কার্যকর্তারা অসামান্য শ্রেষ্ঠতা এবং মান্যতা লাভ করেছেন। যখন একথা বলা হয়েছিল, তখনকার তুলনায় আজ আরও সমীচীন। সংঘের তত্ত্বজ্ঞান, অনুশাসনবদ্ধ কার্যক্রম, পথ সঞ্চলন ইত্যাদি দ্বারা সংঘের যতটুকু পরিচয় সমাজ পায়, তার চেয়ে অনেক বেশী পরিচয় পায় সাধারণ স্বয়ংসেবকদের মাধ্যমে। সংঘকে জানার সবচেয়ে ভাল এবং প্রভাবী মাধ্যম হচ্ছে সংঘের সাধারণ স্বয়ংসেবক এবং তার ব্যবহার। সমাজের মানসে যদি সংঘের স্বরূপ এবং চরিত্রের সঠিক ছবি অঙ্কিত করতে হয়, তাহলে তা সাধারণ স্বয়ংসেবকদের আচরণের দ্বারাই হবে– সাধারণ স্বয়ংসেবকদের পদ এত "মহান দায়িত্বপূর্ণ"। শ্রীগুরুজী আশা করেছেন আমরা স্বয়ংসেবকরা যেন এই দায়িত্বকে বুঝি। সাধারণের অসাধারণত্বের এটাই গূঢ় অর্থ। এই বৌদ্ধিক বর্গ সব স্বয়ংসেবককে অন্তর্মুখ করবে এবিষয়ে আমার তিলমাত্র সন্দেহ নাই।

—শ্রী মাঃ গোঃ বৈদ্য।

■ আমি সাধারণ স্বয়ং সেবক

প্রবাসের সময়ের এক অনুভব আমার মনে পড়ে । স্বয়ংসেবকদের সাথে কথা প্রসঙ্গে কারও পরিচয় জিজ্ঞেস করলে অনেক স্বয়ংসেবক বলে থাকেন "আমি সাধারণ স্বয়ংসেবক" অথবা "সামান্য স্বয়ংসেবক" ইত্যাদি । অনেকবার এরূপ বলার অর্থ দাঁড়ায় আমার উপর সংঘকাজের কোন দায়িত্ব নেই ; আর দায়িত্ব যেন এরকম যে আমার আচরণের ফলে গটনায়ক, গণশিক্ষক আদি কার্যকর্তাকে আমার জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে হয় ; অর্থাৎ শাখায় অনুপস্থিত থাকা, যাতে তাঁরা বাড়ীতে আসেন, ডাকাডাকি করেন আর এভাবে গটনায়ক বা গণশিক্ষক যাতে নিজের কাজে সতর্ক থাকেন; যেন এটাই আমার দায়িত্ব— এরূপ সুর এতে প্রকটিত হয় ।

■ গৌরবের কথা

এখন এই যে "সাধারণ স্বয়ংসেবক" শব্দ প্রয়োগ এতো ভালই, কারণ আমরা সবাই সাধারণ স্বয়ংসেবক । অসাধারণত্ব কোথায় ? সবাই বলে সংঘে নাকি আমার প্রমুখ স্থান । ইংরেজীতে বলে চীফ অব আর এস্ এস্ (Chief of R.S.S.;) কিন্তু আমার কোনও অসাধারণত্ব বা অসামান্যতা আছে কি ? দাড়ি একটু লম্বা; কয়েকদিন দাড়ি না কাটলে আপনার ও লম্বা দাড়ি হবে । এতে অসাধারণত্ব কোথায় ? এখানে ও কয়েকজন বসে আছেন যাঁরা এ ব্যাপারে সচেষ্ট । কাজেই এতে কোন বৈশিষ্ট্য নেই । বেশ আগের কথা মনে পড়ছে ; আমাদের সংঘ প্রতিষ্ঠাতার কথা । উনি সহযোগী কার্যকর্তা বন্ধুদেরকে আগ্রহ সহকারে বললেন — "এইযে সরসংঘচালকের কাজ, তা করার জন্য অন্য কাউকে তৈরী করা হোক, তাহলে উনাকে এই দায়িত্বভার দিয়ে আমি "সাধারণ স্বয়ংসেবক" হিসাবে মুক্তভাবে কাজ করতে পারি । সাধারণ স্বয়ংসেবক কেমন হবেন সে সম্পর্কে আমার কিছু ধারণা, কিছু আগ্রহ আছে । সে ভাবে নিজে আচরণ করে, সাথে যারা কাজ করছেন তাদের সামনে উদাহরণ প্রস্তুত করা যেতে পারে।" কাজেই, 'সাধারণ স্বয়ংসেবক' রূপে থাকাই তাঁর কল্পনায় ছিল। পরিস্থিতিবশতঃ উনি সেভাবে থাকতে পারেননি; সংঘপ্রমুখরূপেই তাঁকে

কাজ করে যেতে হয়েছে। কেন উনি এরূপ ইচ্ছা অথবা আগ্রহ পোষণ করতেন ? তার একমাত্র কারণ হচ্ছে যে আমাদের সংগঠনে সাধারণ স্বয়ংসেবক হওয়া অত্যন্ত গৌরবের; সর্বাধিক গৌরবের । মাঝে-মাঝে যখন দেশে ভ্রমণ করি, কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন,"তোমার জীবনে সর্বাধিক গর্ব করার মত বিষয় কোনটি বলে তোমার মনে হয় ?" তাহলে আমি বলবো 'আমি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের স্বয়ংসেবক ।' গর্ব করার মত এর বেশী আর কিছু নেই । কিছু পড়াশুনা করেছি, কয়েকটি উপাধি পেয়েছি, জনাকয়েক কে পড়িয়েছিও, কোথাও কোথাও গিয়ে ভাষণ দিয়ে থাকি, অনেকে মালা পরিয়ে দেন, অনেকে সাষ্টাঙ্গ প্রণামও করেন । আমার এই বেশভূষার জন্য আমাকে একটু বেশীই প্রণাম করেন, কিন্তু তাতে আমার গর্ব অনুভব হয়না। অনেক বড় বড় লোকের সাথে দেখা হয়, সংঘেতর লোকরাও দেখা করতে আসেন, ধার্মিক ক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ সাধু ব্যক্তিরা আসেন ।আমাদের উপর তাঁদের বড় কৃপাদৃষ্টি ।রাজনৈতিক ক্ষেত্রের লোকরা আসেন, শিক্ষাক্ষেত্রের আসেন, বিভিন্ন সমস্যা উত্থাপন করেন এবং পরামর্শ চেয়ে থাকেন ।এসব কারনে মনে কিছু গর্ব উৎপন্ন হতেই পারে । কিন্তু আমার কখনো এরকম মনে হয়নি যে এসব নিয়ে গর্ব করা যেতে পারে ।গর্ব করার যদি কিছু থেকে থাকে তা হচ্ছে 'ঈশ্বরেচ্ছা এবং সংযোগ বশতঃ আমি সংঘের স্বয়ংসেবক হয়েছি ।'

■ কার্য-ব্যবস্থা

এসব কথার সারমর্ম হচ্ছে যে স্বয়ংসেবক হওয়ার চেয়ে আমাদের জন্য গৌরব এবং সম্মানজনক অন্য কিছু নেই ।এখন আপনারা হয়তো ভাবছেন - তাহলে এই সরসংঘচালক থেকে গটনায়ক পর্যন্ত আমাদের অধিকারীরা আছেন, তাদের সম্পর্কে কি বলা যায় ? এসব হচ্ছে সংগঠনের ব্যবস্থা; ব্যবস্থা ছাড়া কোন সংগঠনেই চলতে পারেনা- আর আমাদেরকেও সংগঠন চালাতে হবে ।কাজেই আমারা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছি, সবাইকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ উনি এখন দায়িত্ববান স্বয়ংসেবক । ব্যবস্থা অনুসারে আজ কিছু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা ঠিক, কিন্তু জীবনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে যদি কিছু স্বীকার করতে হয়, তা হচ্ছে "আমি একজন স্বয়ংসেবক"

এটাই একমাত্র গৌরবের বিষয় ।

অতএব সাধারণতঃ আমরা যখন বলি যে আমি একজন সাধারণ স্বয়ংসেবক, তখন এই দায়িত্বের বোধ আমাদের মনে রাখতে হবে; এই দায়িত্ব খুব বড় দায়িত্ব । সমাজ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে । স্বয়ংসেবক রূপেই সমাজ আমাদের দেখে থাকে । আমাদেরও মনে হয় সমাজ আমাদের উপর খুব বড় বড় আশা রাখুক আর আমরাও সেই সব আশা পূর্ণ করে নিজেদের আরো যোগ্য প্রমাণিত করি ।

■ শাখা কি রূপ হওয়া চাই ?

সাধারণতঃ কি কি বিষয়ে আমরা লক্ষ্য দিব ? প্রথম আমরা শাখার বিষয়েই চিন্তা করি। শাখা কি রূপ হবে?

১। শাখা রোজ হওয়া চাই ।

২। নির্দ্ধারিত সময়ে শুরু হওয়া চাই ।

৩। শাখাতে নানা প্রকারের কার্যক্রম হওয়া চাই ।

৪। স্বয়ংসেবকদের মধ্যে পরস্পর মেলামেশা স্নেহ, প্রেম এবং বিশুদ্ধ পরিবেশ থাকা চাই ।

৫। পরস্পর চিন্তাধারার আদান প্রদান, চর্চা ইত্যাদির দ্বারা নিত্য অন্তরে ধ্যেয়ের দর্শন আরও স্পষ্ট এবং গভীর করার প্রেরণা এবং ইচ্ছা আমাদের থাকা চাই।

৬। রোজ সামূহিক ভাবে প্রার্থনা উচ্চারণ করা; অর্থ বুঝে, গম্ভীরতা এবং শ্রদ্ধাপূর্বক।

৭। পরম পবিত্র এবং প্রতীকরূপ গৈরিক পতাকাকে সবাই মিলে নম্রতাপূর্বক প্রণাম করা।

৮। শাখা 'বিকির' হবার পর বসে একটু আলাপ করা — কে এলো, কে

এলো না ; তার জিজ্ঞাসা ।

দৈনিক শাখার সম্পর্কে এরকমেই নিত্য করণীয় কিছু ব্যাপার আছে ।

■ আমাদের কি করতে হবে ?

১ । শাখা নিয়মিত এবং সময়মত শুরু করার জন্য নির্দ্ধারিত সময়ের বেশ আগেই বাড়ী থেকে বা যেখানেই আমরা থাকি সেখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে এবং শাখা শুরু হবার আগেই (কমপক্ষে দুই মিনিট) সংঘস্থানে উপস্থিত হতে হবে।

কেউ আমাদের ডাকতে আসবে তখন যাব, এরূপ অপেক্ষা করা অনাবশ্যক। যার ডাকার কাজ তিনি তার কর্তব্য করবেন; কিন্তু তার কর্তব্য পালনে সুঅবসর দেবার জন্য আমরা ঘরে বসে থাকব এটা ঠিক নয়, একথা সবাই মনে রাখবেন ।

২ । মনে রাখতে হবে আমি একজন সংগঠক — আমি একা নই । কাজেই শাখার জন্য একটু আগেভাগে বেরিয়ে আশপাশের স্বয়ংসেবকদের ডেকে সাথে নিয়ে যাবনা কেন ? এটাতো সাধারণ বন্ধুত্বের কথা; দায়িত্বের কথা এখানে উঠছে কোথায় ? গটনায়ক বা গণশিক্ষক হবারই বা প্রয়োজন কি ? আমি কোন ভাল কাজে যাচ্ছি, বন্ধুদের ও ডেকে নিয়ে গেলাম । আমাদের বাড়ীর কাছাকাছি শাখায় যাবার রাস্তায় যে সব বন্ধুরা আছেন তাদের ডেকে গল্প গুজব করতে করতে পরমানন্দে সংঘস্থানে যাওয়া, এ কাজ খুব স্বাভাবিক ভাবেই আমরা করব।

৩। সংঘস্থানে সব কার্যক্রম খুব মন দিয়ে, অনুশাসন বজায় রেখে এবং নিয়ম মাফিক করা চাই । তাতে যদি কষ্ট হয়, রাগ করতে নেই । আমাদের কার্যক্রম কষ্ট করেই হয়। কষ্ট করার অভ্যাসের দ্বারা বড় বড় কাজ সহজে করার ক্ষমতা বাড়াতে হয়। এজন্যই কার্যক্রমগুলো চেষ্টা সহকারে করা চাই। এখানে প্রথম বৌদ্ধিকবর্গে আমি বলেছিলাম যে মনে নির্ভয়তা আত্মবিশ্বাস এবং পরাক্রমের ভাব উৎপন্ন করে, আমাদের সবাইকে অনুশাসন বদ্ধ করে, আমরা সবাই যে এক মহতী শক্তির অঙ্গ — এই অনুভূতি নিরন্তর জাগ্রত রাখার জন্যই এসব কার্যক্রম । এজন্যই ভাল করে এর অভ্যাস করা চাই ।

৪ । প্রার্থনা, ধ্বজ প্রণাম এবং ধ্বজাবতরণের পর বিকির হবার সাথে - সাথেই বাড়ীতে যাবার ইচ্ছা কেন হবে ? হওয়া ঠিক নয় । বাড়ীতে অথবা অন্য কোথাও যাবার ইচ্ছা হবার মানেই হচ্ছে আমরা অনিচ্ছায় চাপে পড়ে শাখায় এসেছিলাম,এখন বাঁচা গেল । আমরা কারো চাপে পড়ে তো শাখায় আসিনা । আসা অনুচিত । আমরা বলে থাকি যে হৃদয় পূর্বক আসা চাই । কাজেই চট্ পট্ চলে যাবার ইচ্ছা হবে কেন? আরো একটু সময়ে এখানে বসি এরকম মনে হওয়াই স্বাভাবিক । বসে দুধরণের আলাপ হওয়া চাই —

(ক) কে আসেননি — যে স্বয়ংসেবক বন্ধুরা শাখায় আসেন তাঁদের মধ্যে কে এলেন কে আসেননি তা ভাল করে জেনে নিতে হয়। যে আসেন নি তার না আসার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হয়। এটা তো হলো রোজকার ঔপচারিকতা ।

(খ) ধ্যেয়ের স্মরণ — রোজ ধ্যেয়ের স্মরণ করুন । হিমালয় থেকে দক্ষিণ মহাসাগরের তীর পর্যন্ত অসংখ্য তীর্থস্থান ছড়িয়ে আছে । তার স্মরণ করুন । অনেক ঐতিহাসিক স্থান আছে— প্রত্যেক স্থানের সাথে কোন না কোন মহাপরাক্রমী পুরুষের কিছু বিশেষ কথা যুক্ত হয়ে আছে। তার স্মরণ করুন। সেই মহাপুরুষদের বিশেষতার মধ্যে যে গুণ প্রকটিত হচ্ছে, সবাই মিলে বসে তার স্মরণ করুন এবং ভাবুন ঐ সব গুণ আমাদের মধ্যে আছে কি ? আমাদের মধ্যে ঐ গুণগুলো বিকশিত করার চেষ্টা করছি কি ? অথবা আমরা কেবল শিবাজীর নামই নিচ্ছি ? আজকাল অনেকেই শিবাজীর কথা বলেন, অকারণেই বলেন । উনার গুণগুলো আমাদের মধ্যে আসা চাই । 'শিবাজী' বলার সাথে সম্পূর্ণ ভারতবর্ষে স্বাধীনতা সূর্যের পুনরভ্যুদয় করে, হিন্দু প্রভুতা সম্পন্ন, ধর্মাধিষ্ঠিত পবিত্র রাজ্য স্থাপনার জন্য মহান প্রচেষ্টা যিনি করেছেন সেই অসাধারণ বীর,নীতিবান, চতুর রাজনীতিজ্ঞ এবং অত্যন্ত উজ্জ্বল রাষ্ট্রীয় চরিত্র সম্পন্ন এক পরম বাঞ্ছিত মহান ব্যক্তিত্ব আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয় । তাঁর ঐ সব গুণ আমাদের মধ্যেও হোক । এভাবে এক একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সম্পর্কে চিন্তা করে আমরা নিজেদের গুণ বৃদ্ধির কতটুকু চেষ্টা করেছি ? আবার দুর্গুণ দূর করার

কী চেষ্টা করেছি ? এসব কথা একা এবং সবাই মিলে ভাবা প্রয়োজন ।

৫ । যারা শাখাতে আসেননি, তারা কেন এলেন না তার খোঁজ নেবার জন্য সবার কাছে যেতে হয় ; ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে যেতে হয় । তাদের সাথে দেখা করে কোন অসুবিধা থাকলে তার নিরাকরণ করার চেষ্টা আর যদি কোন অসুবিধা না থাকে তাহলে তাঁকে ভালভাবে এবং মিষ্টি ভাষায় বোঝানো যে অকারণে শাখায় অনুপস্থিত থাকা ঠিক নয় । এমন ভাবে বোঝাতে হবে যাতে পরদিন থেকে তিনি শাখায় উপস্থিত থাকার কথা চিন্তা করেন ।

এই হলো আমাদের নিত্যকার ন্যূনতম কাজ । "সাধারণ স্বয়ংসেবক" হিসাবে এতটুকু আমাদের করাই চাই । এছাড়াও আমাদের কিছু কর্তব্য আছে ।

■ প্রতিবেশীর কর্তব্য

আমরা যেখানে বসবাস করি, তার চারপাশে অনেক ঘরবাড়ী থাকে; সেখানে কিছু লোক বাস করেন । মানে হচ্ছে সবাই মিলে আমরা একে অন্যের প্রতিবেশী। আমাদের প্রতিবেশীর প্রতি কিছু কর্তব্য কর্ম(ধর্ম) আছে । সেই কর্তব্য কর্ম অনুসারে আমাদের এটা জানা প্রয়োজন যে প্রতিবেশীদের জীবন-যাপন কেমন চলছে । উনাদের কোন অসুবিধা বা কষ্ট আছে কি ? তাঁদের সাহায্যের জন্য তৎপর থাকা, এটা প্রতিবেশীর ধর্ম । কোন ও প্রতিবেশী অসুস্থ হয়েছেন তো তার নিজের ভাগ্যে হয়েছেন, বাঁচলে বাঁচুন আর মরলে মরুন – এরকম ভেবে দুর্লক্ষ্য করা প্রতিবেশী-ধর্ম নয় । প্রতিবেশীধর্মতো দূরের কথা এতে তো মনুষ্যত্ব ও রইল না । কাজেই,প্রতিবেশীধর্ম পালনের জন্য আমরা প্রত্যেক বাড়ীতে যাব, সবার সাথে দেখা করব, কথা বলব। সবার সাথে অত্যন্ত স্নেহ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে ; চেষ্টা করতে হবে যাতে সবার মনে আমাদের সম্পর্কে এরূপ ধারণা সৃষ্টি হয় যে এরা বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি, আমাদের প্রতি এদের নিষ্কপট এবং নিঃস্বার্থ প্রেম আছে, এরা আমাদের প্রকৃত বন্ধু, আমাদের কোন কষ্ট হতে দেবে না, সর্বদা পাশে থাকবে এবং সাহায্যের জন্য দৌড়ে আসবে । সবার মনে

আমাদের প্রতি বিশ্বাস থাকা চাই । এই বিশ্বাসের আধারে সব প্রতিবেশীরা মিলে আমরা যেন এক বৃহৎ পরিবার, এরকম এক জীবন ব্যবস্থা গড়ে উঠুক, তারজন্য আমরা চেষ্টা করব । এরকম স্নেহ, আত্মীয়তা এবং বিশ্বাসের পরিবেশ সব প্রতিবেশীদের মধ্যে গড়ে তুলতে পারলে তখন তাদের মধ্য থেকেই সংঘকার্যের জন্য স্বয়ংসেবক ও পাওয়া যাবে ।

■ বুদ্ধির আধারে কাজ হবেনা

কেউ যদি ভেবে থাকেন যে তিনি খুব বুদ্ধিমান এবং বুদ্ধি দ্বারা অন্যদেরকে সংঘের সার্থকতা বুঝিয়ে দেবেন, তাহলে সেটা তার ভুল । ধরে নিলাম আমাদের কাছে বুদ্ধি আছে, আমরা লোকের সাথে বাদ-বিবাদ এবং তর্ক করতে সমর্থ, কিন্তু, আমাদের কথা সবার মনঃপূত হবেই এটা সত্য নয় । তর্কে অনেক লোক হয়তো নিরুত্তর হয়ে যাবেন, অনেকে হয়তো পরাজয় স্বীকার করে নেবেন । কিন্তু আমাদের কাজকে স্বীকার করে নেবেন এরকম মোটেই ভাববেন না । আমার মনে পড়ে— আমাদের একজন ভাল উকীল স্বয়ংসেবক ছিলেন । আমার এক বন্ধু আমাকে বললেন যে সংঘ সম্পর্কে উনার মনে অনেক সন্দেহ এবং প্রশ্ন আছে ; আমার সাথে দেখা করার এবং কথা বলার উনার খুব ইচ্ছা । তাঁর সাথে আমার পুরণো পরিচয় ছিল, উনি কিছুদিন শাখাতে এসেছিলেন । কাজেই আমি উনার বাড়ীতে গিয়ে তাঁর মনের কথা জিজ্ঞেস করলাম । সেদিন উনার সাথে আমার দেড় দুই ঘণ্টা আলাপ হলো । আজকাল এত সময় পাওয়া যায়না ; তখন সংঘের কাজ খুব বেশী ছিল না ; আর আজকাল যে সব ঝামেলা বেড়েছে, তাও ছিলনা । সময় আমার ছিল । দু ঘণ্টায় উনার মনে যত সন্দেহ এবং দ্বিধা তা দূর করার আমি চেষ্টা করেছিলাম । প্রত্যেকবার উনি বলতেন,'একথা ঠিক, কিন্তু গুরুজী- - -' আবার উনি সেই এক কথাই জিজ্ঞেস করতেন । আমি আবার তাঁকে একভাবেই উত্তর দিতাম, আবার উনি বলতেন "আপনার একথা ঠিক গুরুজী, কিন্তু - - -?" আমি তাকে বল্লাম,—"আরে ভাই, আপনার কত 'কিন্তু' আছে ?" আমি এক একটি 'কিন্তু'র সমাধান করছি, আর নূতন 'কিন্তু' জন্ম নিচ্ছে, এ কেমন কথা ? শেষ পর্যন্ত, তাঁকে বোঝানো সম্ভব হয়নি । বুদ্ধির

আধারে তাঁর দ্বিধা দূর করা গেছে, কিন্তু "সংঘের কাজ আমি করব" এরকম উনার মনে ধরেছে, তাতো হলোনা। আমাদের বুদ্ধির অভাব আছে, একথা বলা যায়না। কিন্তু বুদ্ধির সীমা আছে—সীমার ওপারে তা যেতে পারেনা। আমরা কী করতে পারি ?

তবে কেন মানুষ আমাদের কথা মেনে নিচ্ছেন এবং গ্রহণ করছেন ? তার কিছু কারণ আছে।

১। কিছু লোক এরকম থাকেন তারা যেন ভগবানের দ্বারা সংঘকাজের জন্যই নিয়োজিত। যদি কেউ তাঁদের কাছে গিয়ে শাখার যাবার জন্য অথবা সংঘের কাজ করার জন্য বলেন, তো সম্ভবতঃ তাঁর পূর্বজন্মের সংস্কার তৎক্ষণাৎ জেগে ওঠে এবং তিনি আমাদের সহযোগী হয়ে যান। তাঁদের কিছু বোঝাতে হয়না। এরকম অনেক লোক আছেন। এটা একটা কারণ হতে পারে।

২। কিছু লোক নিজেই চিন্তা ভাবনা করে, দেশের পরিস্থিতি দেখে, 'সংঘের কাজ ছাড়া আর গত্যন্তর নেই' বিবেকপূর্বক এরকম চিন্তা করে, কর্তব্য বোধে কাজ করার জন্য এগিয়ে আসেন। আর

৩। কিছু লোক থাকেন স্নেহ এবং মিত্রতা পাবার জন্য লালায়িত, সংঘে এসে এই ক্ষুধা মেটে, তাই তারা আসেন।

■ স্বার্থ থাকা চাই না

কেউ কেউ স্বার্থের খাতিরেও আসেন। একবার একজন উকীল এসেছিলেন শাখায় দেখা হলো। আমিও নিজে একজন উকীল এরকম দেখাচ্ছিলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আজ আপনাকে শাখায় দেখছি যে, কি ব্যাপার ?" উনি বললেন হ্যাঁ, আমার মনে হলো শাখায় যাওয়া উচিত।" আমি বললাম – "এরকম কেন মনে হলো ?" উনি বললেন "অন্য কিছু নয়, সংঘের কাজ ভাল তাই।" আমি ভাবলাম

হঠাৎ উনার এরকম মনে হলো কেন ? কিছু গণ্ডগোল আছে নিশ্চয়ই । তাঁর মনে কি আছে জানা দরকার । যদিও উকীল হিসাবে উনি আমার চেয়ে পুরণো, তবু ভাবলাম একটু গভীরে গিয়ে খোঁজ নেব । আমি এটা ওটা নানা প্রশ্ন করলাম । যা জানতে পারলাম তা হচ্ছে - নাগপুর শহরের উকীল স্বয়ংসেবকদের জন্য কাজের এক পরিকল্পনা হয়েছে; তাঁদেরকে নাগপুর তহশীল এবং জেলায় সংঘের শাখা শুরু করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । প্রতি সপ্তাহে শনিবারে নির্দিষ্ট স্থানে যেতে হয় এবং মঙ্গলবার রাত্রির বৈঠকে ওখানে কি হলো তার বৃত্ত নিবেদন করে আগামী সপ্তাহের পরিকল্পনা তৈরী করা হয় । একথা উনি জানতে পেরেছেন । উনার মনে হয়েছে যে এভাবে সম্পূর্ণ জেলায় উকীলদের পরিচয় হবে । জিলা কেন্দ্রে কাছারী-সংক্রান্ত কাজ তো লেগেই থাকে । পরিচিত লোকরা সেই উকীলের কাছেই যাবেন । "আমিও উকীলদের মধ্যে ঢুকে পড়বো,আমার কাছেও লোক আসবে, রোজগার বাড়বে ।" এই ব্যবসায়িক স্বার্থে উনি এসেছিলেন । আমি তো আগেই বলেছি কেউ কেউ স্বার্থের জন্যও আসেন, উনি স্বার্থের খাতিরে এসেছিলেন । কথায় কথায় আমি তার মুখ থেকে সব কিছু বের করে নিলাম । পরের কথা বার্তা এরকম হলো —

উকীল — জিলার সব লোকেরাই নানা কাজে নাগপুর আসেন ; তাদের সাথে আমার পরিচয় বাড়লে তারা আমার কাছে আসবেন এবং আমার উপার্জন বাড়বে ।

আমি — আপনি পুরো ব্যাপারটা ভাবেন নি ।

উকীল — পুরো ব্যাপার টা কি ?

আমি — আপনি স্বয়ংসেবক এবং বন্ধু ; এজন্য নিজের মনে করে তারা আকর্ষিত হয়ে আপনার কাছে কাজ নিয়ে আসবেন, কিন্তু নিজের লোক হওয়াতে তারা আপনাকে পারিশ্রমিক দেবেন না ।

একথা শুনে উকীল মশাই আঁৎকে উঠলেন,

"আরে বাবা, সত্যি-সত্যি এরকম হয় নাকি ?"

আমি বললাম,"আমার উদাহরণই দেখুন না ।" আমার উদাহরণ দেখুন বলাতে উনি চট্ পট্ বুঝে গেলেন যে এখানে কিছু লাভ হবে না । পর দিন থেকে উনার শাখায় যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল ।

■ .তর্কে বহুদূর

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে মানুষ বিভিন্ন কারণে শাখায় এসে থাকেন,কিন্তু কারো সাথে আমরা তর্ক বিতর্ক করে তাকে তর্কে পরাভূত করলাম এবং নিজের পরাজয় স্বীকার করে উনি বললেন,"ভাল কথা, যাব শাখায়", তারপর শাখায় যেতে শুরু করে দিলেন, এরকম কদাপি হয় না ।" আমরা যদি কেবল বুদ্ধির প্রয়োগ করি, অন্যের চেয়ে আমরা বেশী বুদ্ধিমান এরকম দেখাই, তাহলে কার ভাল লাগবে ? ইনি আমার চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান, আমার বুদ্ধি কম, একথা স্বীকার করতে কার ভাল লাগে ? কারোই লাগবে না ?

তার মনে হবে এটা তার অপমান, সে জন্য সে আমাদের থেকে দূরে সরে থাকবে, পাশ কাটিয়ে চলবে, এ কথা আমি অভিজ্ঞতা থেকে বলছি ।

আমার এক বন্ধু ছিল, একই শ্রেণীতে পড়তাম আমরা; অবশ্য তার কথা ভিন্ন ছিল । তার সাথে তর্ক করতে খুব ভাল লাগতো । সে অনেক পড়াশুনা করেছে, অনেক অধ্যয়ন, তাই তর্কে তার খুব উৎসাহ ; আমাদের মাঝে তর্ক চলত । দুয়েকবার এরকম হলো যে তর্কে সে হাস্যাস্পদ হয়ে গেল । বন্ধুবর্গ তাকে বলতে শুরু করল,'আরে তুমি তো খুব পাণ্ডিত্য জাহির করে বেড়াও, কিন্তু এখানে চুপ মেরে যাচ্ছ কেন ? এভাবে উপহাস হওয়াতে আমার সাথে ভয়ে দেখাই করতো না । সামনে থেকে আমাকে আসতে দেখলে, আশপাশের কোন গলীতে ঢুকে পড়ত । দু চার বার আমি এটা লক্ষ্য করেছি । একদিন এরকমই তাকে গলীতে ঢুকতে দেখে, দৌড়ে গিয়ে ধরলাম, "কোথায় পালাচ্ছ ?" সে বললো "আমি তোমার সাথে কথাই

বলব না । সবার সামনে তুমি আমাকে হাসির পাত্র বানাও । নিজেকে হাস্যাস্পদ এবং অপমানিত করার জন্য কে তোমার সাথে কথা বলবে ?" আমি বললাম "আরে, তুমিই তো তর্ক করতে ভালবাস । আমারতো একেবারেই নাপছন্দ । তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য আমার একটুও ইচ্ছা না থাকা সত্বেও আমি তর্ক করি । আর তর্কে তুমি বেকায়দায় পড়ে যাও । তোমাকে নিয়ে সবাই হাসাহাসি করে । তা আমি কি করব ? ঠিক আছে, এসো আমরা ঠিক করি — আর তর্ক করব না,কেমন ? আরে, তর্ক করার বদভ্যাসের শিকার হয়ে আমরা বন্ধুত্ব ছেড়ে দেব কি ? তর্ক বড় কথা নয়, কিন্তু বন্ধুত্ব থাকা চাই ।" এইভাবে তাকে বুঝিয়ে তখন থেকেই তার সাথে তর্ক করা ছেড়ে দিলাম । কিন্তু সেই দিনই মনে নিশ্চিত ধারণা হ'ল যে তর্কে মানুষ দূরে সরে যায়, কাছে আসে না ।

■ বিশুদ্ধ স্নেহের আধার

তর্ক করলে বুদ্ধির প্রয়োগ হয় ঠিকই, কিন্তু এরকম করলে তা উপকারী না হয়ে অপকারী হয় । তাহলে সবাইকে কাছে কি করে আনা যায় ? আমরা তাদেরকে সংঘের কাজ বুঝাতে পারি সেই পরিস্থিতি কি ভাবে তৈরী হবে ? তার জন্য আমাদের অর্থাৎ আমি এবং যাকে সংঘ বোঝাতে চাই এই দুয়ের মধ্যে মনের একাত্মতা স্থাপিত হওয়া চাই । সে এবং আমি এই দুজনের শরীর ভিন্ন কিন্তু এক আত্মা এরকম অভিন্ন হৃদয় বন্ধুত্বের স্থিতি উৎপন্ন হওয়া চাই । এরূপ স্থিতি উৎপন্ন হলে আমাদের হৃদয়ের ধ্যেয়নিষ্ঠা তার হৃদয়ে প্রবেশ করবে এবং এরূপ বিশুদ্ধ আত্মীয়তার আধারেই এক-এক ব্যক্তিকে নিজের করে নিয়ে তার হৃদয়ে ধ্যেয়ের উপাসনা,ভক্তিভাব জাগৃত করে আমাদের সহযোগী রূপে তৈরী করে নিতে পারি । এর জন্য আমাদের চরিত্র হওয়া চাই অত্যন্ত বিবেকপূর্ণ । প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার, তার জীবনের সাথে ভালভাবে একরস হয়ে, তার সুখ-দুঃখ জানতে হবে, তার সুখ বৃদ্ধি এবং দুঃখ লাঘব করার জন্য সব রকম কষ্ট সহ্য করার জন্য প্রস্তুত থেকে সবাইকে আপন করে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। মনে রাখবেন এ ব্যাপারে যেন আমরা কোন আলস্য না করি। এরই আর এক স্বরূপ হচ্ছে কেবল প্রতিবেশী পর্যন্ত সীমিত না থেকে আমরা

যেখানেই কর্মরত থাকি, সেখানে যাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক হয়, সে সহপাঠী ছাত্রই হোক অথবা কর্মস্থলে উচ্চ বা নিম্নপদের কর্মচারীই হোক বা ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নানা শ্রেণীর লোকই হোক তাদের সাথে আমাদের ব্যবহার এরূপ হওয়া চাই যাতে আমাদের সম্পর্কে তাদের মনে শ্রদ্ধা, আদর এবং আত্মীয়তা উৎপন্ন হয় এবং আমরা সবাই হৃদয় থেকে এরকম হতে পারি। এই আত্মীয়তার ফলে সংঘের বিষয়ে আমাদের গভীর অনুভূতি তাদের হৃদয়ে আপনা-আপনি সংক্রমিত হবে। মনোযোগ সহ আমাদেরকে এরকম চেষ্টা করতে হবে।

■ বিশ্বাস যোগ্যতা ঃ

এসব কাজ "সাধারণ স্বয়ংসেবক" রূপেই আমাদের করণীয়। তার জন্য অসাধারণ হবার কোন প্রয়োজন হয় না। সব স্বয়ংসেবকরাই এসব কাজ করবেন আর সংঘকাজের বৃদ্ধি করবেন। এর জন্য যে সব কথা মনে রাখতে হবে তা হ'ল,

১। আমাদেরকে বিশ্বাসপাত্র হতে হবে,

২। তাদের জন্য কষ্ট স্বীকার করতে সব সময় সম্পূর্ণ তৎপর থাকতে হবে। আবার তাও স্বেচ্ছায় এবং স্বয়ংপ্রেরণায়। কেবল 'করতে হবে' এজন্য কোন ভাবে করছি এরকম নয়; বরং পরস্পর বিশুদ্ধ আত্মীয়তার অনুভব করেই করতে হবে।

কমপক্ষে এই দুটি কথা তো হওয়া চাইই; এছাড়া আরও একটি তৃতীয় কথাও হওয়া চাই আর তা হচ্ছে আমরা যে তাদের মনে সংঘকাজের প্রতি প্রেম উৎপন্ন করতে চাই সেই সংঘের কাজে আমাদের আচরণ আশানুরূপ ভাবে সম্পূর্ণ নির্দোষ হওয়া চাই। না হলে আমরা কাউকে বলব শাখায় আসতে আর আমরাই শাখায় ফাঁকি দিয়ে সিনেমায় চলে যাব, তখন কেউ আসবে? কে শুনবে আমাদের কথা? আমাদের দ্বারা কাজ হচ্ছে না বা আমাদের কর্তৃত্ব প্রকটিত হচ্ছে না তার জন্য অনেক কারণ থাকতে পারে কিন্তু প্রধান কারণ হচ্ছে আমরা সততার সঙ্গে কাজ

করছিনা। আমরা আশানুরূপ ভাবে কাজ করছি না। আমরা ছোট খাটো কারণ দেখিয়ে দৈনন্দিন শাখার কাজে টালবাহানা করে ঢিলেমী দিয়ে থাকি, সেজন্যই কেউ আমাদের আমল দিচ্ছে না। আমাদের আচরণ এরকম হওয়াতে যখন কারো সাথে আমরা কথা বলি, তখন কি উত্তর পাই? —"হ্যাঁ হ্যাঁ জানা আছে আপনাদের কথা, আমরা জানি কি রকম নিশান উড়াচ্ছেন আপনারা।" আমাদের চুপ হয়ে থাকতে হয়। কাজেই অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে— আমাদের নিজেদের আচরণ সম্পূর্ণ ভাবে নির্দোষ হওয়া চাই।

এই দৃষ্টিকোনে আমরা নিজেদের সম্পর্কে চিন্তা করব আমরা সবার বিশ্বাসের পাত্র হয়েছি কি না। বিশ্বাসপাত্র হবার জন্য কিসের প্রয়োজন? আমাদের জীবন পবিত্র থাকা চাই। যে অশুদ্ধ, অপবিত্র হবে, যার মধ্যে অনিষ্ট করার সম্ভাবনা থাকবে তাকে কেউ বিশ্বাস করবে না। কাজেই আমাদের জীবন শুদ্ধ রাখা চাই। শুদ্ধ মানে নির্দোষ, ধোওয়া চালের মত। আমাদের প্রত্যেক স্বয়ংসেবক সম্পর্কে সবার এরকম ধারণা হওয়া চাই, প্রত্যক্ষ এরকম অনুভব হওয়া চাই, যে মানুষ হিসাবে এই লোকটি অত্যন্ত সৎ এবং চরিত্রবান। আমাদের কাছে অনেক বড় বড় আদর্শ আছে— যা চাই তা হচ্ছে স্বয়ংসেবকের অত্যন্ত সচ্চরিত্র হওয়া।

■ শুদ্ধ চরিত্র

আমাদের এই সংঘ কার্যের যিনি নির্মাতা তাঁর আদর্শ আমাদের সামনে আছে। তাঁর চরিত্র ছিল অত্যন্ত নির্মল। পূজনীয় ডাক্তারজীর সময়েরই কথা— এক সাধারণ নির্বাচন হচ্ছিল। ডাক্তারজীর দুজন পুরণো সহযোগী ভিন্ন-ভিন্ন দল থেকে একে অন্যের বিরুদ্ধে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনের সাথে ডাক্তারজীর আত্মীয়তা ছিল। কাজেই এই সহযোগীর জন্যে একটু চেষ্টা চরিত্র করা কর্তব্য ভেবে ডাক্তারজী অল্পবিস্তর কাজ করছিলেন। দ্বিতীয় সহযোগী ছিলেন খুব ভাল বক্তা; গর্জন করে ভাষণ দিতেন, হাজার হাজার লোক তার বক্তৃতা শুনতে আসতেন কেন না শুনে শুনে গালাগালি দিতে তিনি ছিলেন খুব পাকা। আজকাল লোক গালাগালি

শুনতে অভ্যস্ত কাজেই গালাগালি ছাড়া ভাষণ পছন্দ করেন না। হাজারো লোক তার ভাষণ শুনতে আসতেন। সেই সব সভাতে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং তার সহায়ক সমর্থকদের ব্যক্তিগত জীবনের কথা এবং অন্যান্য দোষ বের করে ফুলিয়ে ফাঁফিয়ে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গতে তিনি ছিলেন পারঙ্গত; তিনি এদের এমন দুর্দশা করে ছাড়তেন যে সর্বসমক্ষে জন সভায় দাঁড়িয়ে ভাষণ দেবার সাহস এদের থাকত না। নিজের ভাষণে উনি একথাও বললেন "আমার প্রতিদ্বন্দ্বী যাতে এই শহরে কোন জনসভাই করতে না পারেন আমি এরকম পরিস্থিতি করে ছাড়ব।" উনি করলেন ও তাই। এদিকে ডাক্তারজীর বন্ধু ইচ্ছা প্রকাশ করলেন জনসভা করবেন। ডাক্তারজী বললেন করুন। সভা হয়। সভা বানচাল করার উদ্দেশ্যে কিছু লোক তৈরী হয়েই এসেছিলেন। সভাস্থলে আমাদের ডাক্তারজী চেয়ারে বসেছিলেন। উনার বলিষ্ঠ শরীর দেখে কারো সাহসই হল না গণ্ডগোল করার, ওখানে গোল করলে আখেরে পস্তাতে হবে যে! সভা শান্তিপূর্ণ ভাবেই হল। পরে সেই প্রতিদ্বন্দ্বী বলেছিলেন "কি করব? এর সব সঙ্গী সাথীদের চরিত্র হনন করে তাদের মুখ আমি বন্ধ করে দিয়েছি, কিন্তু যে লোকটির উপর ভরসা করে ইনি দাঁড়িয়েছেন তাঁর বিরুদ্ধে বলার মত আমার কাছে কিছুই নেই"। অর্থাৎ ডাক্তারজী সম্পর্কে কারোই কিছু বলার ছিল না। অন্তরে এবং বাইরে সম্পূর্ণ নির্মল। উজ্বল চরিত্র। কি দোষ দেবেন? কোন কথার হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গবেন? উনার করার মত কি বা ছিল? ঐ লোকটি আরও বলেন "কি করি? ডাক্তারজীর বিরুদ্ধে বলা অসম্ভব, আর এই এক ব্যক্তির উপর ভরসা করে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী তর্জন গর্জন করছে।" আমাদের সামনে এরকম আদর্শ রয়েছে। ডাক্তারজী সম্পর্কে লোকের মনে কত বিশ্বাস ছিল তার অনেক উদাহরণ আছে।

ডাক্তারজীর এক বন্ধুর একবার টাকার প্রয়োজন হল, উনি এলেন ডাক্তারজীর কাছে। ডাক্তারজীর কাছে টাকা পয়সা থাকা ত খুবই আশ্চর্যের কথা। একজন আমাকে বলেছিলেন উনি (ডাক্তারজী) নাগপুরে ডাক্তারী করতেন, কিন্তু আমি ত কখনো উনাকে ডাক্তারী করতে দেখিনি। এটা ঠিক যে দু রকমের ঔষধ উনি সাথে রাখতেন কুইনাইনের বড়ি এবং লিনিমেন্ট আয়োডিন। খেলতে গিয়ে কারো চোট লাগলে তুলো দিয়ে আয়োডিন লাগিয়ে দিতেন, সর্দিজ্বর হলে কুইনাইনের বড়ি খেতে দিতেন। স্বয়ংসেবকদের দিতেন, কিন্তু পেশা করতেন না। উনার কাছে টাকা কোথায়? কিন্তু

সেই বন্ধুর বিশ্বাস ছিল যে ডাক্তারজী কিছু ব্যবস্থা অবশ্যই করবেন। ডাক্তারজী উনাকে বসতে দিয়ে বললেন "নিয়ে আসছি"।

কাছাকাছি দু একজন ধনী বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে কাউকেই পেলেন না। তখন টাঙ্গাতে বসে ব্যারিষ্টার বন্ধু অভ্যঙ্করের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। উনি ছিলেন কংগ্রেসের নেতা। ঘরে বসে এক বন্ধুর সাথে গল্প করছিলেন। উনাকে দেখেই একটু রগড় করে বলে উঠলেন, "আসুন, আসুন, ডাক্তার হেডগেওয়ার! রাস্তা ভুলে এদিকে এলেন নাকি?" তাঁদের সম্পর্ক ঘনিষ্ট ছিল। ডাক্তারজী বললেন, "দেখুন এখন আমার হাতে সময় নেই, একটি ব্যক্তিগত কাজে এসেছি, এখন আমার হাসি মসকরার সময় নেই।" উনি বুঝতে পারলেন, বিষয় গুরুতর। তাড়াতাড়ি ভিতরে নিয়ে গেলেন। ডাক্তারজী বললেন, "এখুনি পাঁচশ টাকা চাই।" উনি বললেন, "কেন? আপনার ওদিককার সব বন্ধুরা কোথায় গেলেন?" ডাক্তারজী বললেন, "ওসব কথা পরে হবে, টাকা দিচ্ছেন কিনা বলুন। দিতে হয়, চটপট দিন; না হলে দিবেন না বলুন। আমি অন্য কোথাও যাব।" ব্যারিস্টার মশাই বললেন, "আরে রাগ করছেন কেন? আপনি এসে বললেন পাঁচশ টাকা চাই, আর আমি দিব না? এসব সম্পত্তি কোন কাজে লাগবে?" তৎক্ষণাৎ উনি পাঁচশ টাকা বের করে দিলেন। ডাক্তারজী প্রমিসরি নোট লিখে দিতে চাইলে ব্যারিস্টার অভ্যঙ্কর বললেন, "আমার মাথা এখনো ঠিক আছে। যদি মানুষ জানতে পারে যে আমি ডাক্তারজীর কাছ থেকে প্রমিসরি নোট নিয়েছি, তাহলে আমার উপর থু-থু ফেলবে। মানুষ বলবে অভ্যঙ্কর পাগল হয়ে গেছে— না হলে ডাক্তার হেডগেওয়ারের কাছ থেকে প্রমিসরি নোট লেখায়? আপনি টাকা নিয়ে যান। সম্ভব হলে পরিশোধ করবেন। না হলে করবেন না। আমি আপনার কাছ থেকে প্রমিসরি নোট লিখে নিতে পারব না।"

আমাদের সম্পর্কেও এরকম কেউ বলবে? বলা চাই। আমাদের মধ্যে এরূপ শুদ্ধতা থাকা প্রয়োজন যেন আমাদের সম্বন্ধেও মানুষের মনে এরকম বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। যে দুটি কথা মানুষের চরিত্র নাশ করে— কাম ও কাঞ্চন, তাও যেন আমাদের অন্তর এরূপ শুদ্ধ এবং নির্লিপ্ত যাতে হয় তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে হবে, সব

ব্যাপারেই মন অত্যন্ত নির্মল হওয়া চাই। আমরা চেষ্টা করতে পারি; কঠিন নয়, অসম্ভব তো কদাপি নয়। তখনই আমরা বিশ্বাসযোগ্য হব! তখন কারো বাড়িতে যাওয়া আসা করলে তার কখনই এরকম মনে হবে না, এই লোকটি কেন আসে। এরকম পরিস্থিতি হবে যে প্রত্যেক বাড়ির দরজা আমাদের জন্য যেন চব্বিশ ঘন্টাই খোলা।

এভাবে নিজে শুদ্ধ চরিত্র হয়ে বিশ্বাসপাত্র হতে হবে এবং সবার জন্য কষ্ট স্বীকার করার প্রস্তুতি ও থাকতে হবে। কষ্ট করা, মন লাগিয়ে কষ্ট করার মানে এটা নয় যে সবার সব কাজের বিনা পয়সার চাকর হওয়া; বরং আমরা কষ্ট করলে তাদের মনে আমাদের সম্পর্কে সম্মানের ভাব, আদরের ভাব, এক শ্রদ্ধাপূর্ণ সঙ্কোচ যেন উৎপন্ন হয় সেজন্যই আমাদের কষ্ট করা উচিত। সাথে সাথে যদি সংঘের দায়িত্ব সম্পর্কে আমাদের ব্যবহার ঠিক থাকে তাহলে মানুষ আমাদের মনের সংঘনিষ্ঠা এবং চিন্তাধারা গ্রহণ করে সংঘের কাজ করার জন্য আমাদের পাশে দাঁড়াবেন।

■ কার্য বৃদ্ধির অর্থ

নিজেকে "সাধারণ স্বয়ংসেবক" মনে করেই আমাদের জীবনপদ্ধতিতে এসব কথাকে স্থান দিতে হবে। কর্তব্য ভেবেই এসব আমরা করব। এর ফলে কি লাভ হবে? এসব কাজ ত বিনা পরিশ্রমে বা হাল্কাভাবে নিলে হবে না; তার জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হবে। মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে— এসব কেন আমরা করব। কেই বলবেন সংঘের কাজ বাড়ানোর জন্যে। কেউ ভাবতে পারেন কার্যবৃদ্ধির মানে কি? অনেক ত হল; সংঘ ত চলছেই। কখনো সংবাদপত্রে নাম আসছে আবার কখনো বিরোধ করেও কথা হচ্ছে। তারাই বা কি করবেন— তাদের বলতে হয়, বলেন। অনেক হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। আর কত কাজ বাড়াতে হবে?

কেন যে কাজ বাড়াতে হবে এটা আমাদের ভাবা দরকার। আমাদের লক্ষ্য কি? হিন্দু সমাজের মধ্যে এক ছোট সংগঠন তৈরী করা আমাদের লক্ষ্য নয়। সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজের সংগঠন করাই আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু এত বিশাল হিন্দু সমাজ কি

ভাবে সংগঠিত হবে? প্রত্যেকটি ব্যক্তি সংঘস্থানে গিয়ে দাঁড়াবেন— এটা কি করে হবে? মানুষ জিজ্ঞেস করবেন এটা কি সম্ভব? তারা ঠিকই বলছেন। একটি কথা নিশ্চিত যে সংঘের কাজ কেবল পুরুষদের জন্য, কাজেই সমাজের কমপক্ষে অর্দ্ধেক সংখ্যা তো শাখায় আসবেন না। অনেকে বলেন আমাদের নেওয়া হয়না কেন? কিন্তু একাজ পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যাদের বয়স খুবই কম তারা আসতে পারে না এবং যারা অতিবৃদ্ধ বা শারীরিক দৃষ্টিতে অসমর্থ তাঁরা ইচ্ছা সত্বেও আসতে পারেন না। পুরণো পরিভাষায় সংঘ শাখায় কারা আসবেন? যারা নিজের দুপায়ে হেঁটে আসতে পারেন তারা। দু পায়ে চলতে শিখেছে এরকম শিশু থেকে শুরু করে যাদের দুপা এখনো জবাব দেয়নি এরকম বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই আমাদের দৃষ্টিতে শাখার জন্য উপযুক্ত স্বয়ংসেবক। অসক্ষম শিশু এবং বৃদ্ধদের বাদ দিয়ে বাকী সবাই শাখায় আসবেন কি? মনে ত হয় আসবেন না। তাহলে কি করা যাবে? তাহলে আমাদের সংগঠন কি কখনো হবেই না? কাজেই আমাদের সম্মুখে কোন সুনিশ্চিত লক্ষ্য থাকা চাই। কী সেই লক্ষ্য?

অনেক আগে একবার আমাদের ডাক্তারজী শতকরা কজন স্বয়ংসেবক হলে এই নূনতম লক্ষ্য পূর্ণ হয়েছে বলে মনে করা হবে এ সম্পর্কে বলেছিলেন। এখন আমি শতকরার হিসাব বলব না; একবার বলেছিলাম, তখন অনেকে এর ভুল অর্থ করেছিলেন। আমি এক জায়গায় বললাম এত প্রতি শত সংখ্যা করতে হবে আর কার্যকর্তারা এমন ভাবে কাজে লেগে গেলেন যেন ঘাড়ে ভূত চেপেছে। যেখানে, সেখানে শাখা, স্বয়ংসেবক দাঁড় করিয়ে আমার কাছে চিঠি এলো, "আমাদের এখানে আপনার নির্ধারিত স্বয়ংসেবক হয়ে গেছে। কাজ পূর্ণ হয়েছে। এখন বলুন কি করতে হবে?" আমি রগড় করে চিঠিতে লিখলাম, "সত্যনারায়ণ কথার আয়োজন করে সবাইকে খাওয়ান এবং সংঘ বন্ধ করে দিন।" কি আর বলব বলুন? শতকরার ব্যাপার নিয়ে কেমন ভ্রান্ত ধারনা দেখুন! অতএব এমন কিছু বলব না যার অনর্থ হয়ে যায়। তাহলে কি বলা যেতে পারে?

■ সম্পূর্ণ সমাজের জন্য

সাধারণ স্বয়ংসেবকের কর্তব্য সম্পর্কে আমরা যা ভেবেছি তাকে বলা হয়েছে সম্পূর্ণ সমাজের সাথে আত্মীয়তা এবং স্নেহ সম্বন্ধ স্থাপনের কথা। কেবল নিজের শহর অথবা নিজের শাখার পরিসরেই নয় বরং পুরো হিন্দু সমাজের সাথে সম্বন্ধ প্রস্থাপিত করতে হবে। শহরবাসী, গ্রামবাসী, দুর্গমবন এবং গিরিগুহায় বসবাসকারী সবাই আমাদের বন্ধু। তাঁদের সবার সাথে আমাদের নিত্য সজীব সম্বন্ধ থাকা চাই, আত্মীয়তার সম্পর্ক, মেলামেশা, বিশ্বাস এবং সহযোগিতার সম্পর্ক থাকা চাই; তার জন্য যত কার্যকর্তা প্রয়োজন তত কার্যকর্তাযুক্ত শাখা চাই এবং তা সারা দেশে বিস্তৃত, নিত্যনিয়মিত হওয়া চাই। ভাবুন, এটা কত বড় কাজ এবং এই কাজ আমাদের করতে হবে। এর চেয়ে কম কাজ হলে আমাদের সন্তুষ্টি হবে না। কাজেই সেই ন্যূনতম সীমা পর্যন্ত আমাদের কাজকে বাড়াতে হবে এবং তারপর দেখতে হবে কাজ যেন কম হয়ে না যায়। অর্থাৎ কাজের এই বৃদ্ধি এবং তারপর নূন্যতম সীমাতে কাজকে স্থির রাখার আজীবন করণীয় কাজ আমাদের সম্মুখে। এখন আমাদের ভাবতে হবে বর্তমানে আমাদের কাজ কতটুকু এবং যা হওয়া চাই সেই তুলনায় কত কম। "সাধারণ স্বয়ংসেবক" রূপে আমাদেরকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে এবং এতে কোন ধরণের শিথিলতা অথবা টালবাহানা কত অনিষ্টকারী, অনুচিত এবং অশোভনীয় তা চিন্তা করে তদনুসারে পুনরায় আমাদের জীবন রচনা করতে হবে এবং কর্মশীল কার্যকর্তারূপে এগিয়ে যেতে হবে। এত শীঘ্রতার কারণই বা কি? কারণ আমাদের পরিস্থিতি আমাদের চোখের সামনে। হিন্দু সমাজ নিজেকে বিস্মৃত হয়েছে। অনেকের মধ্যে "আমাদের রাষ্ট্র" একথা বলার সাহস ও নেই। মাতৃভূমির প্রতি প্রেম অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে পড়েছে; ফলে সমাজ স্বার্থে হাবুডুবু খাচ্ছে। স্বার্থের ফলে দুর্গুণ এবং দুর্নীতি বাড়ছে। দলবাজী, দ্বেষ এবং মাৎসর্য্য প্রভাব বিস্তার করছে। পুরো সমাজ খণ্ড-বিখণ্ড এবং ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যেন অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এরূপ পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি।

■ নান্যঃ পন্থা

আমাদের বিভেদ আরও বাড়ানোর উদ্দেশ্যে অনেক শত্রু আমাদের ঘরের ভিতরেই আছে। তারা সিঁদ খুঁড়ে আমাদের সমাজকে ধ্বংস করার কোন সুযোগই হাতছাড়া করছে না। এদের সাহায্য করার জন্য আছে বাইরের শত্রুরা। বহিঃশত্রুর দ্বারা আমাদের সম্পূর্ণ দেশ পরিবেষ্টিত হয়ে আছে। সব সীমাতে দাঁড়িয়ে শত্রুরা প্রত্যাহ্বান জানাচ্ছে, অনুপ্রবেশ করছে। কে জানে, কখন সোজা আক্রমণ করবে এরা। আমরা নিজেদের মধ্যে হিংসা-দ্বেষ, লড়াই ঝগড়া, চরিত্রহীনতা, রাষ্ট্রের বিস্মরণ ইত্যাদি দোষের ফলে এক প্রকার অরাজকতার পরিস্থিতি উৎপন্ন করেছি এবং এধরণের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দশায়, প্রত্যক্ষ আক্রমণ হলে তার মোকাবিলার শক্তি আমাদের নেই এরূপ এক অবস্থা দেখতে পাচ্ছি। এই পরিস্থিতিতে একটিই উত্তর আমাদের কাছে আছে। সেই উত্তর ঘরে বলে বিলাপ করা নয়। কোন তৃতীয় দেশ শত্রুকে অস্ত্র-শস্ত্র দিচ্ছে এসব বলে কান্নাকাটি করা কাপুরুষতা এবং স্ত্রৈণতার লক্ষণ। আমরা কি নালিশ করে বেড়াব? নাকি তাদের চেয়েও অধিক শক্তিশালী হয়ে রূখে দাঁড়াব? পরাক্রমী, বহুগুণ সম্পন্ন, স্বাভিমানী রাষ্ট্রের কর্তব্য কি? নালিশ করা? আমরা নিজেদের বাহুবলের ভরসায় দাঁড়াব, আমাদের দাঁড়াতেই হবে। অজুহাত দেখালে চলবে না। অন্যরা আমাদের আক্রমণ করছে এসব বলে কান্নাকাটি করলে হবে না। ওরা তো আক্রমণ করবেই; যতক্ষণ আমরা নিজেদের দুর্বল করে রেখে আক্রমণের পথ প্রশস্ত করব, তারা আক্রমণ করবেই, আঘাত হানবেই।

তাহলে আমাদের কাজ কি? এই যে বিশৃঙ্খল সমাজ, এই সমাজ আত্মবিস্মৃতির ফলেই ছিন্ন-ভিন্ন হয়েছে, এই বিস্মৃতি দূর করতে হবে। আমার মাতৃভূমি, সম্পূর্ণ সমাজ আমার, এই রাষ্ট্র আমার, আমার এই মাতৃভূমিতে আমার রাষ্ট্রজীবন সম্পূর্ণ সমর্থ, বৈভব সম্পন্ন, প্রভূত্ব সম্পন্ন হয়ে স্বাভিমানের সাথে পৃথিবীতে আত্মবিশ্বাসের সাথে দাঁড়াবে এরূপ অনুভূতি প্রত্যেকের অন্তরে উৎপন্ন করতে হবে। এই জাগৃতি এবং আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের আধারে সম্পূর্ণ সমাজকে আত্মবিশ্বাসের সূত্রে গ্রথিত করতে হবে। সবাইকে অনুশাসন বদ্ধ করে আসেতুহিমালয় সমাজকে এখন

এক সংগঠিত রাষ্ট্রশক্তিরূপে দাঁড় করাতে হবে যা সব সঙ্কটকে অতিক্রম করে জয়লাভ করতে সমর্থ হবে। অন্য আর কোন রাস্তাই নেই। অন্য যে রাস্তার কথা বলা হয় সে সব কোন কাজের নয়, কেবল বলার জন্য এবং উপরি-উপরি। আমাদের সমাজ শরীরে প্রবিষ্ট সব মলিনতা দূর করে শরীরকে সম্পূর্ণভাবে শুদ্ধ করে তার সমগ্র চৈতন্য এবং শক্তিকে পুনরায় জাগৃত করার কাজই আমাদের সংঘের কাজ। এছাড়া উদ্ধারের উপায় নেই।

ভগবানের আশীর্বাদে এই কাজ করার সৌভাগ্য আমরা পেয়েছি। আমরা এর সাধারণ স্বয়ংসেবক। এই অসাধারণ শ্রেষ্ঠ সম্মান আমরা পেয়েছি। এই কথা মনে রেখে আমরা কাজে তৎপর হব। প্রত্যেকের সম্পূর্ণ শক্তি, বুদ্ধি এবং সময় কাজে লাগিয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ইপ্সিত সংঘকার্যের অত্যন্ত বিস্তৃত স্বরূপ দিতে হবে। এটা আমাদের কর্তব্য, সবাই একথা স্মরণ রাখবেন এবং তারজন্য অধিকাধিক যোগ্যতা অর্জন করে যাবেন, এই মুহূর্তে সবে ভাইদের কাছে এটাই আমার প্রার্থনা।

☆ ☆ ☆

প্রকাশক ঃ প্রেরণা প্রকাশনী
কেশব নিকেতন, অম্বিকাপট্টি, শিলচর - ৭৮৮ ০০৪

প্রথম সংস্করণ ঃ মকর সংক্রান্তি, ১৯৯৮ ইং
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ মকর সংক্রান্তি, ২০০৮ ইং

মূল্য ঃ ৫.০০টাকা

মুদ্রক ঃ মহামায়া প্রেস এণ্ড বাইণ্ডিং
ফোন- (০৩৩) ২৩৬০-৪৩০৬